ইউরোপের একক সংবিধানকে ‘না’

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর জন্য একক সংবিধান প্রবর্তনের চেষ্টা চলছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসের জনগণ সেই প্রচেষ্টাকে ভেস্তে দিয়েছেন। দেশ দু’টিতে গণভোটে ‘না’-র বিজয় একক সংবিধানের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দিয়েছে... লিখেছেন **হাসান মূর্তাজা**

প্রথমে ফ্রান্স। এরপর নেদারল্যান্ডস। দেশ দুটির জনগণ জানিয়ে দিল, তারা ইউরোপের জন্য একক কোনো সংবিধান চায় না। চাওয়া-না চাওয়ার ব্যাপারটি দেশ দুটিতে সীমাবদ্ধ থাকলে কোনো সমস্যা ছিল না। সমস্যা হচ্ছে, ২০০৪ সালের ১৮ জুন ব্রাসেলসে ইউরোপের নেতৃবৃন্দ ইইউর জন্য একক সংবিধানের যে চুক্তি করেছিলেন তাতে স্পষ্ট বলা আছে, সংস্থার কোনো এক সদস্যও যদি সংবিধানটি নিজ দেশের সংসদে অনুমোদন না করে বা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সংবিধানটি কার্যকর হবে না। অর্থাৎ ফ্রান্স ও ডাচ জনগণের ‘না’ ইউরোপের সংবিধানের মৃত্যুঘন্টা বাজিয়ে দিল। ইউনিয়ন নেতাদের কপালে তাই গভীর ভাঁজ। কেননা, দুটি দেশের জন্য ইইউর ২৫টি দেশের ভাগ্য ঝুলে গেল।

ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডস ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রস্তাবিত সংবিধানটির ভিত্তি ছিল ইইউর প্রতিষ্ঠাকালীন মূলনীতিসমূহ। কাজেই এ প্রত্যাখ্যান খোদ সংস্থাটির অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ফ্রান্স ও ডাচ সরকার জনমত উপেক্ষা করে সংসদে সংবিধানটি অনুমোদন করবে এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। যদিও ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট হোসে ম্যানুয়েল বারোসো সব সদস্য দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন, যেকোনো প্রকারে সংবিধান অনুমোদন করার। অবস্থাদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে, আগামী ১৬-১৭ জুন ব্রাসেলসে কাউন্সিল সম্মেলনে প্রস্তাবিত সংবিধানকে বাতিল বা স্থগিত ঘোষণা করা হবে। এ বছর এবং সামনের বছর আরো অন্তত ৭টি দেশে সংবিধানটির ব্যাপারে ‘হ্যাঁ/না’ ভোট হবার কথা রয়েছে। এসব গণভোটের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না সে প্রশ্নও উঠেছে। মোট কথা, ইউরোপজুড়ে এখন হতাশার সুর।

সংবিধানপন্থিরা অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করছিল। এরা মূলত উদারপন্থি এবং সোস্যাল ডেমোক্র্যাট। তাদের আশা ছিল, একক সংবিধান প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ইউরোপ নতুন শতাব্দীতে শক্তিশালী বিশ্বনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আমেরিকার সমান্তরাল বিশ্বব্যবস্থার জন্ম দেবে। যদিও এর ফলে ইউরোপ যুক্তরাষ্ট্রের মতো কোনো ফেডারেল রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে যেতো না। ইইউভুক্ত দেশগুলো স্বাধীনই থাকতো। তবে অভিবাসন, কর্মসংস্থান, শ্রমিক পরিবহন, সামাজিক ভাতা, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা, মানবাধিকারের ইস্যুগুলোর ব্যাপারে একত্রে বসে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। একক সংবিধানে ইইউর জন্য একক পররাষ্ট্রনীতির কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপের একক সংবিধান কেন প্রত্যাখ্যান করলো ফ্রেঞ্চ এবং ডাচরা। এ বিষয়ে জনমত বিভক্ত। একক কোনো কারণ নির্ধারণ দুরূহ। ‘না’ জয়যুক্ত হবার পেছনে কারণ অনেকগুলো- ইউরো মুদ্রা গ্রহণে অনীহা, বড় দেশের দাদাগিরি, ব্রাসেলসে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দেশীয় মূল্যবোধ ও জাত্যাভিমান, সার্বভৌমত্ব খাটো হবার ভীতি ইত্যাদি। সংবিধানপন্থিদের অভিযোগ, দুটো দেশ ক্ষমতাসীন দল ‘হ্যাঁ’ পক্ষে পর্যাপ্ত প্রচারণা চালায়নি।

সংবিধানবিষয়ক চুক্তি গণভোটে নাকচ হবার পর নড়েচড়ে বসেছেন ইইউ নেতৃবৃন্দ। ইউনিয়নের ভেতরে যে একটা চাপা ক্ষোভ এবং দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গণভোটে ‘না’ বিজয়ী হবার মাধ্যমে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক এজন্য ফ্রান্সকে দোষারোপ করেছেন। বলছেন, ফ্রান্স কখনোই বৃহত্তর ইউরোপের ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেনি। জার্মানরা যেমন অতীত ভুলে ইউরোপের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে এককাতারে এসে দাঁড়িয়েছে, নাকউঁচু ফরাসিরা তেমনটি পারেনি। ফ্রান্স বরাবরই নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যস্ত থেকেছে। অবশ্য ফ্রান্সকে এভাবে একতরফা দোষারোপ করা ঠিক হবে না। মনে রাখতে হবে, পঞ্চাশের দশকে নিস চুক্তির মাধ্যমে জন্ম নেয়া ইইউর প্রতিষ্ঠাতা ছয় সদস্যের অন্যতম ফ্রান্স। অন্যদিকে ব্রিটেন ও ডেনমার্ক আজ অবধি ইউরো মুদ্রা গ্রহণ না করলেও ফ্রান্স শুরু থেকেই ইউরো চালু করেছে। অন্যদিকে ব্রিটেন, ইটালি ও স্পেন আমেরিকার লেজুরবৃত্তি করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে

হায় প্রাইভেসি!

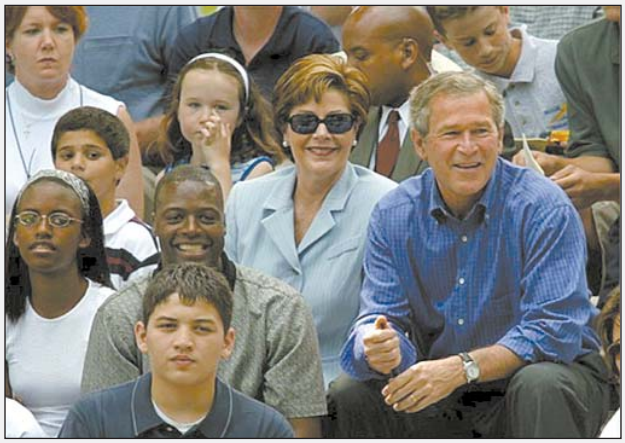

µ‡dv‡W wb‡Ri †i‡Ä ek : Ggb mgq Le KgB cvb wZwb

প্রেসিডেন্ট বুশ জানিয়েছেন তিনি ই-মেইল করেন না। ভয়, মেয়ে বা অন্যদের কাছে তার পাঠানো ব্যক্তিগত মেইলগুলো ফাঁস হয়ে যেতে পারে। কেননা, হোয়াইট হাউসের যাবতীয় ই-মেইল আর্কাইভে সংরক্ষণ করা হয়। কাজেই লোক জানাজানির ভয় আছে।

বুশ একা নন। রাজনীতিবিদরা বরাবরই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে লোক জানাজানির ভয়ে ভীত থেকেছেন। ১৯২৯ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হুভার বলেছিলেন, 'মাছ ধরাই একজন প্রেসিডেন্টের একমাত্র অবসর বিনোদন। প্রেস এবং জনগণ এই একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না।' ১৯৭৩ সালে রিচার্ড নিক্সন আক্ষেপ করেছিলেন- তার নিরাপত্তা নয়, প্রাইভেসি দরকার। যদিও তা হবার নয়।

কাজেই বুশ প্রাইভেসি নিয়ে আক্ষেপ করবেন এটাই স্বাভাবিক। বুশ ছ'বছর টেক্সাসের গভর্নর থাকাকালে তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে প্রেসের এতো মাতামাতি ছিল না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। হোয়াইট হাউস বা ক্যাম্প ডেভিডে কারা বুশের সঙ্গে দেখ করেন বা রাত যাপন করেন, সব নামের তালিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। যদিও বুশ তার ব্যক্তিগত খামারবাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথিদের নাম প্রকাশ করেন না। টেক্সাসের ক্রফোর্ডে ১৫৮৩ একর আয়তনের খামার হাতে গোনা সেই সব স্থানের একটি, যেখানে বুশ 'নিজেকে হারিয়ে ফেলেন'- বলেছেন হোয়াইট হাউসের সাবেক প্রেস সচিব আঁরি ফ্লেচার।

ফ্লেচার আরো জানিয়েছেন, সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ফোন করে বন্ধুদের ঘুম ভাঙানো প্রেসিডেন্টের পছন্দের কাজগুলোর একটি। অবশ্য বুশের বন্ধুরা কেউই হোয়াইট হাউস বা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সম্মতি ছাড়া প্রেসের কাছে মুখ খোলেন না।

রোনাল্ড রিগ্যানও তার ক্যালিফোর্নিয়া র‍্যাঞ্চে অবসর কাটাতে পছন্দ করতেন। ১৯৮৫ সালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি যখন সেখানে যাই, মনে হয় পৃথিবীটা অন্যত্র চলে গেছে।' তবে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউসের বাইরে যেখানেই যান, নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘিরে থাকে। ফলে বিনোদনের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়ে যায়।

মার্কিন প্রেসিডেন্টর মেয়াদ শেষ হবার পর তার ব্যক্তিগত রেকর্ড প্রকাশ করাই নিয়ম। যেমন- জিমি কার্টারের প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে হোয়াইট হাউসে তার থাকাকালীন ঘুমাতে যাওয়া ও ওঠার সময়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ফোন কল সব রেকর্ডই পাওয়া যাবে। এমনকি ১৯৭৯ সালে ক্রিসমাসের দিন নিক্সন পরিবারের সঙ্গে যে 'দি ব্ল্যাক স্ট্যালিওন' ছবিটি দেখেছিলেন, সে তথ্যও সেখানে আছে।

হোয়াইট হাউসে থাকাকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের খুঁটিনাটি সব তথ্যই রেকর্ড রাখা হয়। রক্তচাপ, ট্যাক্স রিটার্ন, সম্পত্তির আর্থিক মূল্য ইত্যাদি। যেমন- বুশের সম্পত্তির মূল্য ১০-৫০ লাখ মার্কিন ডলার। প্রেসিডেন্টদের ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত ঘেঁটে ঐতিহাসিকরা রীতিমতো গবেষণা-সন্দর্ভও রচনা করে ফেলেছেন। 'প্রাইভেসি নেই' বলে প্রেসিডেন্টরা রীতিমতো হাপিত্যেস করলেও হোয়াইট হাউস ছেড়ে পালিয়েছেন, এমন নজির কিন্তু নেই।

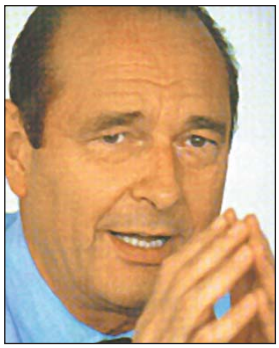

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী শিরাক

ডাচ প্রধানমন্ত্রী পিটার বলকেনেড

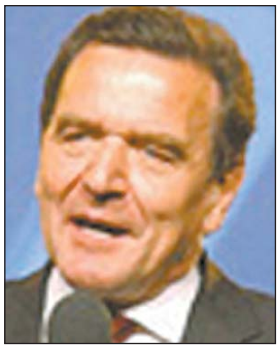

জার্মান চ্যান্সেলর শ্রোয়েডার

ফ্রান্সের প্রভাব হ্রাস করার। ফরাসি জনগণ ব্যাপারটি ভালোভাবে নেয়নি।

এ মুহূর্তে একক সংবিধান কার্যকর না হলে ইইউতে তেমন কোনো গুরুতর সমস্যা হবে না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্যক্রম আগের মতোই চলবে। তবে আসছে অক্টোবরে ইইউতে তুরস্কের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে যে আলোচনা হবার কথা, তাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া ইইউর হাতে সংবিধান বিকল্প কোনো 'বি প্ল্যান' নেই। কাজেই আখেরে ইউরোপের সম্প্রসারণ ও আর্থ-সামাজিক সংস্কার কাজ মন্থর হয়ে পড়বে।

ইউরোপের ভবিষ্যৎ যাই হোক, বিশ্লেষকরা এশিয়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখছেন। 'ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সের' উপদেষ্টা ডমিনিক মোজি মনে করেন, ইউরোপের সংবিধান চুক্তি প্রত্যাখ্যাত হবার ফলে ২১ শতক হবে এশিয়ার। তার কথায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্ভবত 'ম্যাগনা হ্যালভেশিয়া' বা একটি বৃহদাকার সুইজারল্যান্ড কিংবা সংস্কৃতি ও উন্নত জীবনের 'জাদুঘরে' পরিণত হতে যাচ্ছে। ইতিহাসের এই ক্রান্তিকালে ফরাসি ভোটারদের 'না'র কারণে আগামী শতকের দখল নেবে এশিয়া।

মোজির বক্তব্যে হতাশার সুর স্পষ্ট। ইউরোপকে যারা আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন, তাদের আশাহত হওয়াই স্বাভাবিক। একটা সত্য এখন পরিষ্কার, ইউরোপকে এখনো অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে।